মৃতদেহ কাঁধে তুললে কতটা ওজন তুমি এখনো জাননা

Posted on June 7, 2025 by Aparna Ghosh
মৃতদেহ কাঁধে তুললে কত টা ওজন–তুমি এখনো জাননা।

দুহাতে ছড়াও খই—-লঘু শোক

শাদা ও প্রতীকি

কিঞ্চিত বিষণ্ণ হয়ে ভাবো,খুব অংশ নেওয়া হলো

মৃতদেহ কাঁধে তুললে কতটা ওজন—-তুমি কিছুই জানো না।

—–রণজিৎ দাশ,কবিকে।

মৃতদেহ কাঁধে তুললে কতটা ওজন তা হত্যাকারীর হিসেবের দায় নেই ,কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক সমাজের হিসেব রাখার দায় আছে,সেই বোঝা অনুভব করার দায় আছে,রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র প্রণোদিত হত্যার ওজনে সমাজ কতখানি ভারাক্রান্ত ও সন্ত্রস্ত। কোন অদ্ভুত দেশে বাস করি,দলিত যুবক অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের শিশুকে আদরে ‘বেটা’বলে ডাকার প্রতিদানে খুন হয়ে যান? ঘটনা গুজরাটের আমরেলি জেলার।গুজরাট।দেশের প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্য।

গোমাংস বহনের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশে চার মুসলমান যুবককে অকথ্য মার,লাশ হয়ে যেতেই পারতেন তাঁরা,যেমন আখলাখ হয়ে গিয়েছিলেন।ঘটনা দুটি সবেমাত্র ঘটেছে। সদ্য-স্মৃতি,তাই উল্লেখ। বাদবাকি ‘কিঞ্চিত বিষণ্ণ হয়ে ভেবে’ ভুলেগেছি।ভুলে যাই ,ভুলে যাচ্ছি বলে সমাজের একটা বড় অংশকে পরিকল্পিত ভাবে কোথাও মননে আর কোথাও সরাসরি হত্যাকারী বানিয়ে তোলার প্রকল্প এতটাই সফল ,যে একটা ভুলে যাওয়ার উপর আরেকটা ‘ভুলে যেতে হবে ‘এমন ঘটনা প্রায় রোজ ঘটছে।মার খাচ্ছেন আর মরে যাচ্ছেন দলিত এবং মুসলমান নাগরিক।গত ১১ বছরে ধর্মীয় অপরায়ণ ও জাত-হিংসার কারণে যারা অত্যাচারিত হলেন ,যতটুকু গোচরে এসেছে একবার ফিরে দেখা যাক।কারণ প্রতিদিন সামাজিক পরিসরে দলিত এবং মুসলমান হওয়ার জন্য যে অপমান ও খুচরো নিপীড়ন চলতে থাকে তা ওই ‘মৃতদেহের ওজনের’ মতই উচ্চবর্ণ ও সংখ্যাগুরুর অজানা,খানিকটা বোধের বাইরেও।অতএব সংবাদ শিরোনামে এসেছিল যা যা—

যারে তুমি নীচে ফেল…

মহম্মদ আখলাখ ,দাদরি উত্তরপ্রদেশ ২০১৫

পেহেলু খান ,রাজস্থান ২০১৭

তাবরেজ আনসারি ,ঝাড়খণ্ড ২০১৯

২০১৫ থেকে ২০১৮ মাত্র এই তিন বছরে, হিউম্যান রাইটস কমিশন বলছে, গোরক্ষকরা খুন করেছে অন্তত ৪৪ জন মুসলমানকে।

এতে অবশ্য বিস্মিত হওয়া চলে না।প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত বিজেপি নেতারা ধর্মীয় ঘৃণা ভাষণকে একটি প্রকল্পে পরিণত করেছেন, যার খসড়া ১০০বছর ধরে আরেসেস লিখেছে।যাদের আদর্শগত পিতা দামোদর সাভারকর ১৯২৩ সালে লিখে রেখে গেছেন “There is no nation of Indians in real existence outside the Hindu religion”। রাষ্ট্রপোষিত মিডিয়া এই ন্যারেটিভ কে সংখ্যাগুরুর শোওয়ার ঘর অবধি পৌঁছে দিয়েছে।ক্রিস্তফ জাফ্রেলো যাকে বলছেন “an ethno-nationalist project that seeks to exclude muslims from National body politic.” কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দিকে তাকিয়ে দেখুন, স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবার একজনও মুসলমান কোন মন্ত্রকের দায়িত্ব পাননি।গতবারের মন্ত্রীসভায় অবশ্য পেয়েছিলেন কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে হিংসা তাতে কিছুমাত্র কমেনি।সংবিধানকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে সরকার CAA র মত অসাংবিধানিক আইন পাস করেছে।প্রতিবাদ রুখতে দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় মদতে নৃশংস হত্যাকান্ড চলেছে ২০২০ সালে,মৃত ৫০ জনের অধিকাংশ মুসলমান। তাঁদের বাড়ি জ্বালানো হয়েছে,ধ্বংস করা হয়েছে মসজিদ।আর প্রায় সব মসজিদের নীচেই একটা করে মন্দির আছে,এই আশ্চর্য ইতিহাস যত্ন করে শুধু মিডিয়া বা হোয়াটস অ্যাপ ইউনিভার্সিটিতে নির্মাণ করা হচ্ছে এমনটা নয়,রীতিমত পোষা বুদ্ধিজীবী নিয়োগ করে তত্ত্ব নির্মাণ চলছে।

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান….

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত,বহুত্ববাদ আর বহুস্বর ধারণে গর্বিত তার সংবিধান। দলিত ও জনজাতি সমাজের জন্য affirmative action হিসাবে চালু আছে সংরক্ষণ। তার জন্য প্রতিনিয়ত তাঁদের অপমানের শেষ নেই।প্রজন্ম-বাহিত

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুঁজি সম্পন্ন উচ্চবর্ণ ‘কোটার মাল,সোনার চাঁদ,সোনার টুকরো ‘ ইত্যাদি বিবিধ অভিধায় চিহ্নিত করে ‘বিনা যোগ্যতায় সব চাকরি শুষে খেয়ে নেওয়া’র অভিযোগে তাঁদের অপরায়িত করতে থাকেন,এই অপমান খুন হওয়ারই সামিল।তো এহেন সংরক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি পাওয়ার পরও জাতভেদ ব্যবস্থায় দীর্ণ এই ভারতীয় সমাজে দলিতদের অবস্থান ঠিক কেমন—–অসংগতভাবে দরিদ্র,রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিকায়িত দলিত সমাজ গ্রামীণ জনজীবনে বহু ক্ষেত্রে এখনো অস্পৃশ্যতার শিকার।বাবাসাহেব বেঁচে থাকলে দেখতেন এখনো অনেক জায়গায় তাঁরা মন্দিরে ঢুকতে পারেন না।সাধারণের পুকুরের জল ও শ্মশানে তাঁদের অধিকার নেই।তাঁদের শিশুও যদি ভুল করে এসব বিধি লঙ্ঘন করে ফেলে তাহলে পিটিয়ে মেরে ফেলাটা দস্তুর। নভসরজন ট্রাস্টের ২০১৮ সালের সমীক্ষা বলছে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্যে ৬০%শতাংশ গ্রামে “ অস্পৃশ্যতা” র চর্চা চলে,সংবিধান অনুযায়ী যা দন্ডযোগ্য অপরাধ। দলিত নারীর অবস্থা করুণতম।উচ্চবর্ণের দ্বারা ধর্ষণ, হিংসা ও খুন স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়েছে।হাথরাস,উন্নাও হিমশৈলের চূড়া মাত্র। ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ড বলছে শুধুমাত্র ২০২১ সালে দলিত মানুষের বিরুদ্ধে ৫০০০০অপরাধ সংগঠিত হয়েছে এবং বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে সংখ্যাটা বাস্তবে অনেক বেশি। কোন কিছুই নতুন কথা নয়,কিন্তু অন্ধকারে আছি,এবং তা ক্রমশ ঘনতর হচ্ছে একথা বারবার মনে করা প্রয়োজন।আমাদের শেষ আশ্রয় বিচারব্যবস্থা। সমীক্ষা বলে,জাতভিত্তিক অপরাধের শিকার দলিতসমাজ সবচেয়ে বেশী সুবিচার-বঞ্চিত।পুলিস এবং জুডিশিয়ারিতে উচ্চবর্ণের আধিপত্য। সামাজিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার অজুহাতে জাত-ভিত্তিক অপরাধ বিচারব্যবস্থার দোরগোড়া অবধি পৌঁছাতেই পারেনা।অনেকেরই মনে থাকবে ২০১৮ সালে POA act(prevention of atrocities act,1989) কীভাবে লঘু করার চেষ্টা করা হয়েছিল,সুপ্রিম কোর্টের দুই উচ্চবর্ণ বিচারপতির এজেলাসে।দলিত জনতার প্রবল প্রতিবাদে মোদি সরকার পিছু হঠে,অবশ্য এই সিদ্ধান্ত আগামী ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে দলিত প্রেমের ফয়দা তুলতেই নেওয়া হয়েছিল।

যে নৃশংস হত্যার কথা দিয়ে এই লেখাটি শুরু হয়েছিল তাতে ফিরে আসি

আরেকবার।অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের শিশুটিকে ‘বেটা’ বলে ডাকার অপরাধে দলিত যুবক গণপ্রহারে মারা গেলেন।তারসঙ্গে থাকা অন্য তিন জন দলিত মারাত্মক ভাবে প্রহৃত হলেন।এই শিশুটির বাবা ,যিনি লোক জুটিয়ে এই ভয়ংকর হিংসা ঘটালেন,তিনি কোন রাজনৈতিক নেতা নন বা বিরাট কেউকেটা নন,একজন ওবিসি সম্প্রদায় ভুক্ত ছোট দোকানদার।কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা দলটি দীর্ঘ - কালাশ্রিত ধর্ম আর জাতের আপাত লুকানো অভিসন্ধি গুলিকে চূড়ান্ত হিংস্রতার সাথে উন্মুক্ত করে সমাজের ভিত্তিমূল অবধি পৌঁছে দিয়েছে।বিভাজনের এই রাজনীতি কীভাবে সমাজের নানা স্তরে নিজের খেলাটি খেলার অমিত ক্ষমতা ধরে বাবাসাহেব আম্বেদকর ব্যখ্যা করেছিলেন –”cast is not a division of labour;it is a division of labourers. It is a hierarchy in which the division of labourers is graded one above the other.” [Annihilation of Cast] আপাত দৃষ্টিতে মুসলমান এবং দলিত ভিন্ন আঙ্গিকের বৈষম্য, হিংসা ও নিপীড়ন সহ্য করেন বলে মনে হয়।একটি ধর্ম ও অন্যটি জাত।কিন্তু দারিদ্র, শিক্ষা- বঞ্চনা ও অন্যান্য ভিত্তিমূলক অধিকারের মাপকাঠিতে এই দুই সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত।

দলিত মুসলমানরা দ্বিমুখী বৈষম্যের শিকার।দৃঢ-গ্রথিত জাতব্যবস্থার প্রভাবে ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় মুসলমান সমাজেও রয়েছে জাতভেদ।সাচার কমিটি রিপোর্টে(২০০৬) তার বিশদ উল্লেখ আছে।এঁদের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই দলিতদের থেকেও পশ্চাদপদ,সাচার কমিটির পর্যবেক্ষণ।যে দলিতরা মুসলমান বা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাঁরা দলিত হিসাবে সংরক্ষণের সুবিধাটুকুও পান না।হিন্দুত্বের বিভাজনের নকশাটি এতই শক্তিশালী যে তা সবচেয়ে বঞ্চিত দুটি সম্প্রদায়কে ,স্বাভাবিক রাজনৈতিক মিত্রতার পরিবর্তে বারবার আত্মঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে দিতে পেরেছে।

জাতের নামে বজ্জাতি : একটি ঔপনিবেশিক জাত- জালিয়াতি প্রকল্প

বর্তমানের রাষ্ট্র এবং তীব্রভাবে বিভাজিত ও মেরুকৃত সমাজ সংঘপরিবারের

১০০ বছরের অভীষ্ট পূরণ –কিন্তু এর তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক অক্সিজেন তারা জোটাতে পেরেছিল ঔপনিবেশিক নীতিগুলির মধ্য থেকে ।বলা ভাল অন্য সবাইকে পিছনে ফেলে ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ধারক,বাহক এবং প্রয়োগকারী হল বিজেপি ও সংঘ-পরিবার।শুনতে আশ্চর্য লাগতে পারে।ডি-কলোনাইজেশনের (ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবশেষ অপসারণ) স্বঘোষিত নেতা নরেন্দ্র মোদি আইনবিধির সংস্কৃত নাম দেন,গীতা আওড়ান,পার্লামেন্টে সাধুসঙ্গ করেন,মন্দির বানান ,ডাকঘর থেকে গঙ্গাজল বেচার বন্দোবস্ত করেন ,প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার নামে বিজ্ঞান সম্মেলন গুলিকে তপোবনের রূপকথা বানিয়ে তোলেন––এ তালিকা তো অন্তহীন। সংকট কালে ধর্মীয় ঐতিহ্য ,পুরান ,রূপকথা খুবই রাজনৈতিক লাভ দেয়। এসব তো ভোট-রাজনীতির তাৎক্ষণিক লাভ। সামাজিক আধিপত্যের বৃহত্তর নকশা,হিন্দু- রাষ্ট্র নির্মাণের উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক পুঁজির গর্ভে জন্ম নিয়েছে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজের ধাত্রী স্বাভাবিকভাবেই ছিলএকটি নো- নেশন(জাতি ধারণা বিহীন) ভূখন্ড। বিচিত্র , জটিল ও স্থানিক জাত-বর্ণ-ব্যবস্থা ছিল এর বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব ছিল অসমসত্ত্ব।দক্ষিন,পূর্ব এবং আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের থাকবন্দী কাঠামো উত্তরের তুলনায় কম মনোলিথিক ছিল।এই বৈচিত্র ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের স্বার্থে সম্পূর্ণ বদলে যায়। ব্যপক জাত-ধর্ম ভিত্তিক সমীক্ষাগুলি এবং একক আইনবিধির (ইউনিফায়েড কোড) মধ্য দিয়ে একটি বৃটিশ সরকার অনমনীয় এক সামাজিক জাত- বিন্যাস তৈরী করে। তার অব্যবহিত ফল হিসাবে এদেশে ঔপনিবেশিক শাসকের মিত্রশক্তি উচ্চবর্ণ ও তার অসমসত্ত্ব আধিপত্য একটি নিয়মিত সামাজিক স্থিতি লাভ করে।১৮৬৫-৭১ নৃতত্ত্ব ও জাতভিত্তিক সমীক্ষাগুলির আংশিক প্রতিপাদনের যুগ।কুখ্যাত রিজলী রিপোর্ট মানুষকে জাত,ধর্ম,সামরিক,মেয়েসুলভ ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ে ভেঙে ফেলে। ১৮২০ সাল থেকে ভারতীয় সিপাহী-সেনার অন্দরে জাতপাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়।১৮৫৭ র বিদ্রোহের পর আতংকিত বৃটিশ

সরকার জাত-পাতকে কাঠামোয় বাধার প্রয়োজন বোধ করতে থাকে।বলা বাহুল্য এই ধরণের জাত-ধর্ম পরিচিতি মূলক সমীক্ষাগুলি পশ্চাৎপদের উন্নতিকল্পে করা হয়নি,বরং শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখতে বিভাজন দৃঢ করে জাতব্যবস্থাকে একটি নিয়মতান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছিল।রিজলী তো এতদূর বলে ফেলেছিলেন “The social position of a caste varies inversely as its nasal index.” আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব ও জাতিচিহ্নায়নের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বৈত প্রয়োগে লক্ষ লক্ষ মানুষের মানবিক পরিচয় জাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুর দিকে ১৭৭৬ এ কলকাতায় মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবকে বিচারক বানিয়ে জাতিমালা কাছাড়ি তৈরী হয় হয়েছিল।জাতি-পরিচয় নিয়ে বিবাদ মেটানো ছিল তার কাজ।পয়সাকড়ির বিনিময়ে বা প্রভাব খাটিয়ে এখানে জাত উঁচু- নিচুও করা হত এমনটাও ইতিহাস বলে।পরে তা উঠে যায়,কারণ শাসক জাত-ব্যবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় বেঁধে ফেলে।উদাহরণটি এই জন্য টানা,যে জাত-ব্যবস্থাকে সংহত করে আরো পীড়নাত্মক ও কঠোরতর করেছিল বৃটিশ শাসক। তাই আকস্মিকভাবে মোদী সরকার জাতগণনায় রাজী হয়ে গেলে ভীতি উদ্রেক হয়। যাইহোক, ঔপনিবেশিক শক্তির উদ্দেশ্য যাই থাক,জাতভিত্তিক জনগণনা নিপীড়িত নিম্নবর্ণের কাছে আত্মস্বরূপ উন্মুক্ত করে দেয়।

জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে কংগ্রেসের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবর্ণ-উচ্চবর্গ নেতৃত্ব বৃটিশের দাগানো পথেই এগিয়েছেন।নিম্নবর্গীয় দলিত সমাজের মূলধারায় উত্তরণ তাদের লক্ষ্য ছিল না। কারণ বোঝা কঠিন নয়,দলিতের রাজনৈতিক উত্থান তাদের কাম্য ছিল না।ফলে ধীরে ধীরে নিম্নবর্গ-নিম্নবর্ণের নিজস্ব রাজনীতি বিকাশলাভ করতে থাকে বিংশ শতকে এসে।মহারাষ্ট্রে অবশ্য সাবিত্রীবাঈ ফুলে-জ্যোতি রাও ফুলে উনবিংশ শতকের শেষে (১৮৭৩) সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।ওই একই শতকে মধ্যপ্রদেশে(অধুনা ছত্তিসগড়) সৎনামী আন্দোলন শুরু হয়।এরপর বিংশ শতকে পেরিয়ার(তামিলনাড়ু),এজাভা(কেরালা),দলিত বৌদ্ধ আন্দোলন ,নমশুদ্র আন্দোলন (বাংলা)ইত্যাদি উচ্চবর্ণ - ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন দলিত রাজনীতির প্রাঙ্গণ তৈরি করে।মনে রাখতে হবে সমসময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা নিচ্ছে।সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রমিক-কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত করছে।অথচ দলিত আন্দোলনগুলির সাথে তার সম্পৃক্ততা তৈরি হল না।মালিক-জমিদার বিরোধী লড়াই এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী লড়াই বৃহত্তর অর্থে ঐক্যবদ্ধ মুক্তির লড়াই বা শ্রেণি সংগ্রামে পরিণত হতে পারে –সে সম্ভাবনা গুলি অননুশীলিত রয়ে গেল।জাতীয় সংগ্রামের চূড়ান্ত সংকটকালে এবং পরবর্তীতেও এর ফল ভাল হল না।

অন্যদিকে,হিন্দুরাষ্ট্রের পালকি-বেহারা হিসেবে নিম্নবর্ণকেও মুসলমানের বিরুদ্ধে দরকার পড়বে বুঝে সাভারকর অস্পৃশ্যতা ও জাত-ব্যবস্থার পক্ষে না দাঁড়ালেও গোলওয়ালকর কিন্তু বৃটিশের মতই বৈচিত্র-রহিত ,কাঠামোকঠিন জাতিভেদ ব্যবস্থার গুণগান গেয়ে গেছেন।এখন বিজেপি দলিত আদিবাসী রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে,অখন্ড হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়ে আদিবাসী জনজাতিকে হিন্দুধর্মের আওতায় এনে মুসলমানের বিরুদ্ধে উস্কায়,অন্যদিকে বনবাসী জনজাতির জল,জঙ্গল,জমি কর্পোরেটের হাতে তুলে দেবে বলে লাগাতার গণহত্যা, ধর্ষণ, আগ্রাসন চালিয়ে যায়।অরণ্য আইন জারি করে রেলপথ ,কৃষি-বাগিচা,খনি অঞ্চল,নিত্য-নতুন বাণিজ্য-নগর তৈরি করতে বহু অরণ্যবাসী সম্প্রদায়কে ‘অপরাধ-প্রবণ উপজাতি” দাগিয়ে ঠিক এই কাজটাই বৃটিশ করেছিল।এখন ‘অপরাধ-প্রবণ’ এর নতুন নাম ‘মাওবাদী’।

ধর্ম…উল্টো জগতের উল্টো চৈতন্য….

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দু মুসলমান তাদের ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে বেঁচেছেন। মিলন-বিরোধ দুই ছিল।কিন্তু এই ধর্মীয় পরিচয়ের সংকীর্ণ রাজনীতিকরণ ঘটেছে বৃটিশ শাসকের হাতে।পাশাপাশি সকল শ্রেণি-বৈচিত্র মুছে ভারতীয় মুসলমানকে একটি এক-রঙা ধর্মীয় পরিচিতিতে হ্রাস করার নীতি শাসকের পক্ষে লাভজনক ছিল।সমাজ-মানসে সংকীর্ণ জাতি-চৈতন্য তৈরী করে

বিপুল জনসংখ্যার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে বৃটিশ সরকার।অপরায়নের শুরু এখান থেকে।তথাকথিত বঙ্গীয় নবজাগরণ শিক্ষিত উচ্চবর্ণ হিন্দুর জাতীয়তাবাদী বয়ান তৈরির আকাংখার উন্মেষ ঘটিয়েছিল,তার সহজ শত্রু মুসলমান।জাতীয় বীর নির্মাণ করতে গিয়ে খুঁজে পাওয়া গেল তাঁদের যারা মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।যদিও সেসব যুদ্ধ একেবারেই ধর্মীয় ছিল না।বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী(১৯০৫) স্বদেশীর যুগ এইসব নির্মাণের মধ্য দিয়ে হিন্দুবীর ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের জমি তৈরি করে।ওই সময়ে মহারাষ্ট্রের ’শিবাজি উৎসবের’ অণুকরণে বাংলায় ‘প্রতাপাদিত্য উৎসব’ চালু করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তিভাজন হয়েছিলেন সরলাদেবি চৌধুরানী।যাইহোক ,সমগ্র সাধারণ মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে এই হিন্দু-জাগরণের প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় পরিচিতির আচ্ছাদনের তলায় একশিলা অস্তিত্বে পরিণত হলেন।১৯০৬ এ প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম লীগ। উচ্চবর্ণ হিন্দু জমিদার ও পরবর্তীতে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি কংগ্রেসের মতই উচ্চবর্গীয় মুসলমানদের দল মুসলিম লীগ সমগ্র মুসলমান সমাজের একছত্র প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াল।তবে সংখ্যাগুরুর প্রতিনিধি দল হিসাবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাভালাভ নির্ভর করত সে কত ধরনের রাজনীতিকে তার অন্দরে জায়গা করে দিতে পারে উচ্চবর্ণ-বর্গ আধিপত্য বজায় রেখে,তার উপরে।এজন্য বর্ণবাদী হিন্দু আধিপত্য থাকলেও সেখানে নানা ধরনের মতাদর্শ জায়গা পেয়েছিল,এতেই ছিল তার রাজনৈতিক লাভ।উল্টোদিকে কঠোর মুসলমান পরিচিতি ছিল মুসলিম লীগের রাজনৈতিক হাতিয়ার।কিন্তু এর বাইরেও কি মুসলমানের অন্য রাজনীতি ছিল না?ছিল।কিন্তু এই দুটি বড় দলের লড়াই ও বৃটিশ মদত সেইসব ক্ষুদ্র ও ভিন্ন স্বর কে চাপা দিয়ে দিয়েছে।

বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি ছিল এমন একটি জনপ্রিয় দল,পরে যা রাজনৈতিক গুরুত্ব হারায়। এই পার্টির নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসের অসহযোগিতায় বাধ্য হন মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মত সাম্প্রদায়িক দলগুলির সাথে সমঝোতা করতে।কংগ্রেস কোথাও সক্রিয়ভাবে,কোথাও নিস্ক্রিয় উদাসীনতার দ্বারা এই ধরণের অসাম্প্রদায়িক মুসলমান শক্তিগুলির উত্থানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি করে তুলতে

কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দায় সন্দেহাতীত। এই জায়গাটুকু অন্তত শ্রেণির আলোকে না দেখলে বোঝা মুশকিল।

আজ ‘ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে তাই মুসলমান রা তাদের পাকিস্তানে চলে যাক’ ভয়ংকর এই দাবিকে ধীরে ধীরে সংঘ পরিবার সমাজমানসে চারিয়ে দিয়েছে,এর চেয়ে বড় মিথ্যে এবং অযৌক্তিক দাবি আরকিছু হতে পারেনা।সাধারণ নিম্নবর্গের মুসলমানরা সবাই দেশ ভাগ চেয়েছিলেন? না চাননি।ছোট একটা উদাহরণ দিই।১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের বিপুল নির্বাচনী সাফল্য দর্শিয়ে ভারতীয় মুসলমানরা দেশভাগের পক্ষে ছিলেন এমনটাই সাবিদ করার চেষ্টা চলে। শুধুমাত্র বৃটিশ প্রভিন্স (দেশীয় রাজ্য বাদ)এ হওয়া এই নির্বাচনে ভোট দেবার যোগ্যতা ছিল ২৫% মুসলমানদের। তাই দেশভাগ সমগ্র মুসলমান সমাজের ম্যান্ডেট ছিল না।বিশেষত নিম্নবর্ণ মুসলমান মোমিন,আনসারি মূলত জোলা(তাঁতী)প্রভৃতি সমাজের মানুষেরা এরপক্ষে ছিলেন না।তারা মনে করতেন না মুসলিম লীগ সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি।১৯৪০ এ মুসলিম লীগের লাহোর কংগ্রেসে পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হবার পর ১৯৪১ এ বিহার এবং উত্তর প্রদেশের নিম্নবর্ণীয় এই বস্ত্র কারিগরেরা নিজেদের জীবিকা বাঁচাতে ও পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০০মানুষের জমায়েত করেছিলেন।কংগ্রেস এদের জায়গা দেয়নি।মোমিন কনফারেন্সের নেতা আব্দুল কায়াম আনসারি চিঠিও লিখেছিলেন নেহেরুকে ১৯৩৯ সালে,লেজিসলেশনে নিম্নবর্ণ মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ চেয়ে যাতে তাঁরা নিজেদের স্বর তুলে ধরতে পারেন।ফলপ্রসু হয়নি,কারণ তাতে হিন্দু কন্সটিটিউন্সেতেও জাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবি ন্যায্যতা পেত।এর রফা তো ১৯৩২এর পুণাচুক্তিতে হয়ে গিয়েছিল।অনশন করে গান্ধীজি আম্বেদকরের কাছ থেকে তা আদায় করে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ‘প্রাসাদ রাজনীতি’ ধর্ম ও জাতের রাজনীতিকে নিজের নিজের সপক্ষে আকার দিতে পেরেছিল।মুসলমানদের মধ্যে জাত-শোষণের প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়।ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপর চিরকালের ছাপ পড়ে যায়, ‘তাঁরা দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক এবং ভারতে থাকলেও পাকিস্তানকে ভালবাসেন’’। সারাজীবন ধরে মুসলমান কে দেশপ্রেমের

পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়।পেহেলগাম ঘটনায় সোসাল মিডিয়ায় থাকা মুসলমান সমাজকে আরেকবার দু:খময় এই পরীক্ষা দিতে দেখতে পেয়েছি,কিন্তু সমাজের প্রত্যন্ত স্তরে এই পরীক্ষা আরো কত দুঃসহ,কত নৃশংস তা হয়ত আমাদের মত মানুষের বোধের বাইরে রয়ে গেল।

যাইহোক, ওইসব ঘটনাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম থেকে শত হস্ত দূরে থাকা সাম্রাজ্য-সমর্থক সংঘপরিবারের পূর্বসূরিদের হাত শক্ত করতে থাকে।১০০বছর ধরে আরেসেস এইসব উপাদানের উপর ভর করে তার কর্মসূচির সুবিশাল নকশা(গ্র্যান্ড ডিজাইন) তৈরি করেছে। ‘দ্বিজাতিতত্ত্বের’ আদি প্রস্তাবক সৈয়দ আহমেদ খান হলেও লীগের ‘পাকিস্তান প্রস্তাবের’ অনেক আগে সাভারকর ‘দ্বিজাতিতত্ত্ব’এর প্রচারণা করেছেন। হিন্দুমহাসভা,আরেসেস ঘোষিতভাবে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বকে সমর্থন করেছে। এসব তথ্য অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। ‘দ্বিজাতিতত্ত্ব’ এর দায় মুসলিম লীগ ও জিন্নার একার ঘাড়ে চাপালে ইতিহাস বিকৃতি হবে। বিজেপির নেতাদের ক্রমাগত মুসলমান বিরোধী ঘৃণা-বমন আকাশ থেকে পড়েনি।তার গভীর শিকড় আছে।

হে আমার দু:খ,স্বাধীনতা,তুমিও পোশাক পড়…

৪৭ এ ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান রচনাকালে বাবাসাহেব আম্বেদকরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার ফলে সংবিধানে দলিত সমাজের জন্য সংরক্ষণ ও জাত-হিংসার বিরুদ্ধে ছোট হলেও একটি জায়গা তৈরী হয়।কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জন্য এসবের জায়গা ছিল না।ফলে পরবর্তীতে ঘুরপথে সংখ্যালঘুর সামগ্রিক মানোন্নয়নের বদলে তাঁদের নিছক ভোটারে রূপান্তরিত করে ঘুষ দেবার খেলা চলে, ‘দুধেল গাই’ ন্যারেটিভ নতুন নয়,অন্য অন্য নামে এ এক দীর্ঘ নির্মাণ প্রক্রিয়া।

সাংবিধানিক ধর্ম নিরপেক্ষতা সামাজিক ভাবে তার অর্থ উৎপাদন করতে পারেনি।সাচার-কমিটি রিপোর্ট সবার পড়া দরকার।বৃহত্তর মুসলমান সমাজ সর্ব অর্থে সাংবিধানিক নিরাপত্তার বাইরে থেকে গেছেন।এর কুফল ও প্রতিক্রিয়া যা হবার তা হয়েছে।ইসলামফোবিয়ায় ভুগতে ভুগতে এগুলোও বিশদে জেনে নিতে হবে বৈকি। অন্যদিকে সংবিধানে দলিত সাধারণের জন্য শুধুমাত্র আইনী সংরক্ষণ জাত-ব্যবস্থা জনিত ঘৃণা-সংস্কৃতির বিলোপ ঘটাতে পারেনা, দলিতকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।সে ব্যর্থতা প্রতিদিন ভারতীয় গণতন্ত্রকে অন্তঃসারশূণ্য করে তুলছে।

We the people of India….

একটু পিছন ফিরে সংবিধান পরিষদের গঠনতান্ত্রিক দিকে চোখ রাখলে দেখব,প্রতিনিধিদের অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেসের উচ্চবর্ণ হিন্দু।

India’s constitution :how democratic how just প্রবন্ধে অচিন ভানায়েক লিখছেন

“The asymmetries of class power are obscured in the constitution by propping up a notion of the “people’s will”,as expressed through electoral democracy. The constitution is testament to the fact that the members of the original Constituent Assembly, incidentally not elected by universal suffrage,were overwhelmingly members of the congress party…..’

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা ,অস্পৃশ্যতা বিরোধিতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবি কীভাবে বাস্তবতা পাবে এবং যাঁদের জন্য পাবে,তাঁদের কন্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হল না প্রথম থেকেই।রাজনীতি থেকে আমলাতন্ত্র সর্বত্র রয়ে গেল হিন্দু উচ্চবর্ণ আধিপত্য। স্বাভাবিক ভাবেই সংবিধানে থাকা নেহেরুভিয়ান

সমাজতন্ত্রের ধারণা,ধর্ম নিরপেক্ষতার তত্ত্ব ‘প্রাসাদ পরিসরে’ সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ আজ হিন্দু-রাষ্ট প্রকল্পের খাঁড়া হয়ে মাথার উপর ঝুলছে,উচ্চবর্ণের হিন্দু রাষ্ট্র।

ঐতিহাসিক আয়েষা জালালের বক্তব্য খুব সোজা-সাপটা —-

“communalism in India was not the expression of primordial religious identities ,but the result of calculated strategies by colonial rulers and indigenous elites to secure their own power.”[The sole spokesman : jinnah,the Muslim League ,and the demand for Pakistan]

কোন পথ ,কোন পথ বামদিকে আঁকা….

ঔপনিবেশিক সময়ে বাম রাজনীতি বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।শ্রমিক ধর্মঘট এবং কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করেছে।কৌশলগত ভুল-ভ্রান্তি থাকলেও ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থে কমিউনিস্ট কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।১৯৪৬ এর প্রবল সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন বিস্ফোরিত হয়েছিল।মুসলমান ও হিন্দু কৃষক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলেন।স্বাধীনতা পরবর্তীতে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছে।গত কয়েক দশকে শতধা-বিভক্ত বাম ধারার শক্তিহ্রাস ঘটেছে ক্রমাগত। আন্তর্জাতিক বাম-রাজনীতি ও প্রেক্ষাপটে তার এক বিস্তৃত আলোচনা অনত্র হতে পারে। কিন্তু এই সময়ে যে বিষয় দুটি তুমুল হিংসা ও রক্তস্নাত যাত্রায় বিবর্তিত হচ্ছে, তা হল মুসলমান সমাজের আরো আরো অপরায়ন ও দলিত সমাজের আরো আরো প্রান্তিকায়ন ও বিচ্ছিন্নকরণ।এই দুটি বড় শিরোনামের মধ্যে উদ্দিষ্ট জন সমাজের ভাষা,নারী, শিশু,প্রান্তিক লিঙ্গ-যৌনতার

মানুষের বিচিত্র প্রকারের অবদমন,নিপীড়নের কথাও এসে পড়ে।সেই গভীরতায় না গিয়েও গোটা আকারে পরিচিতির লড়াই গুলি বামশক্তি কীভাবে দেখছে,বিশ্লেষণ করছে তার আলোচনা খুব জরুরী। তার কারণ একমাত্র বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি এই কঠিন সময়ে ভারতের মাটিতে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত বাস্তব চেহারাকে আইনী গলি ও তার হদ্দগলি থেকে বার করে রাজপথে নিয়ে আসার সম্ভাবনা রাখে। ফ্যাসিসট বিজেপি ও সংঘ পরিবারের প্রকৃত শত্রু বাম ভাবধারা। কারণ সে পার্লামেন্ট পরিসরে যত শক্তিহীনই হোক,বুর্জোয়া পার্লামেন্ট তার প্রকৃত শক্তির জায়গা হওয়ার কথাও নয় ,এটা বিজেপি বোঝে,তাই বাম ভাবাদর্শ বিপদজনক। নরেন্দ্র মোদি,একটি সাক্ষাৎ কারে বাম পার্টিগুলো না বলে বাম-বিচারধারা সর্বাগ্রে উৎখাত করা দরকার বলে ব্যক্ত করছিলেন।অর্থাৎ নির্বাচনী ফল যাই হোক সংঘ পরিবারের অবাধ সামাজিক আধিপত্য ও সংবিধানে ক্রমাগত অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে হিন্দু-রাষ্ট গঠনের পথে প্রকৃত প্রতিরোধ হয়ে উঠতে পারে বামপন্থা।নির্বাচনে ভোটের হিসেব তো থাকবেই,বৃহত্তর বাম ভাবাদর্শের কথা ভাবার সময় বোধহয় সংসদীয় বামদলগুলির এসেছে।

পরিচিতির সমস্ত লড়াই আসলে ‘deflected class struggle’।প্রতিসৃত শ্রেণিসংগ্রাম।প্রতিটি পরিচিতিগত বৈষম্য, পুঁজিবাদের অসহনীয় চাপকেই আরো বাড়িয়ে তোলে।জাত–ব্যবস্থা কোন সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ নয়।পুঁজির লাভ বাড়িয়ে তোলার হাতিয়ার। সংখ্যালঘুর অবদমিত স্বরেও একই যন্ত্রণা লিপি লেখা আছে।এই সমস্ত অবরুদ্ধ স্বরগুলির এখনো বাম-রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়নি।ছোট-বড় দলগুলিতে উচ্চবর্ণ নেতৃত্বের ঐতিহাসিক অধিষ্ঠান।শুধু সংহতি জানানো নয়,প্রতিটি পরিচিতির লড়াইতে নিহিত শ্রেণি-সংঘাতকে চিহ্নিত করে তাতে সম্পৃক্ততা না বাড়াতে পারলে নিপীড়িতের শ্রেণি-ঐক্যের সম্ভাবনাগুলি বিনষ্ট হতে থাকবে।

ভয় ছড়িয়ে আর জাতি-গর্বের ধ্বজা উড়িয়ে সংঘ পরিবারের ইকোসিস্টেম দখল করেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ,গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়া ও হিন্দু মগজ,চলছে হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের সম্মতি আদায়।ভারতীয় আধুনিকতার অসম

বিকাশ নিও-লিবারেল জমানায় এসে প্রবল সুরক্ষাহীনতার মুখোমুখি। সামাজিক সুরক্ষা,রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ভূমিকা এর নিষ্ঠুর রথের চাকার নীচে পিষ্ট হয়ে গেছে।গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দানব কর্পোরেটের সামনে অসহায়।নিও-লিবারেল পলিসি গুলোকে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ভাবে প্রয়োগ করতে পারে বিজেপির মত চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি।তাই শাখা-প্রশাখা বিস্তারের জন্য এটা হিন্দুত্ববাদ ও সংঘ-পরিবারের পক্ষে অতি উর্বর সময়।

‘হিন্দুত্ত্ব’ একটি চিরস্থায়ী হিংসার তত্ত্ব। দীর্ঘ অংশীদারিত্বের ইতিহাসকে বর্জন করে জনসমাজের নানা অংশকে সে খন্ডিত,বিতাড়িত,অবমানবায়িত করে একটি হিংস্র,বর্ণ ও ধর্মভিত্তিক ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।এর জন্য প্রতিটি ‘পরিচিতি’ কে প্রয়োজন মাফিক সংজ্ঞায়িত করে,বিভাজন করে ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নামিয়ে আনে। আদিবাসী, দলিত,নারী,সংখ্যালঘু,প্রান্তিকায়িত লিঙ্গ-যৌনতার মানুষ, কে তার রাষ্ট্রীয় হিংসার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে? পাচ্ছে না, তার কারণ এই প্রতিটি অবদমিত পরিচিতির লড়াই প্রকৃতপক্ষে শ্রেণি-সংগ্রামের বীজ ধারণ করে।

বিপুল দারিদ্রপীড়িত ,অসুরক্ষিত ,শিক্ষাবঞ্চিত যৌবনকে ধর্মগর্বের নামে সে সমস্ত প্রান্তিক-পরিচিতির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে পারছে।এই বিপন্ন ও বিষণ্ণ সময় আন্তোনিয় গ্রামশির লেখা স্মরণ করিয়ে দেয়।

“The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born ;in this interregnum,a great variety of morbid symptoms appear.”[prison Notebooks]

হিন্দুত্ব সেই ‘মরবিড’ লক্ষণ।

বাম-গণতান্ত্রিক ও প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তর্বিরোধ ও আন্ত:মতাদর্শগত সংঘাত মুলতুবী রেখে(পারস্পারিক সমালোচনা

সহই)এক না হতে পারে,তা শুধু পার্লামেন্টারি নয়,সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনীতির ব্যপ্ত পরিসরেও,তবে প্রতিদিন লাশের বোঝা, রক্তপাত,হিংসা,ধর্ষণ,আগ্রাসন সমাজমানসে স্বাভাবিক হয়ে আসবে।আমাদের চোখের পাতা কারোর জন্য ভিজে উঠবে না আর।

“অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে?

রিরংসা,অন্যায়,রক্ত,উৎকোচ,কানাঘুষো,ভয়

চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?”

জীবনানন্দ দাশ,বিভিন্ন কোরাস।

ঋণ

বাবাসাহেব আম্বেদকর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নজরুল ইসলাম

সুমিত সরকার

ক্রিস্তফ জাফ্রেলো

আয়েশা জালাল

অচিন ভানায়েক

ও অন্তর্জালে পাওয়া বিভিন্ন সমীক্ষা ও প্রতিবেদন।

About the Author

Aparna Ghosh
Author

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint
View All Posts

Aparna Ghosh

+ posts
Editorial Board Member of Alternative Viewpoint